সাদা পৃষ্ঠা, তোমার সঙ্গে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সাদা পৃষ্ঠা, তোমার সঙ্গে

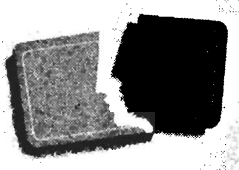

সাদা পৃষ্ঠা, তোমার সঙ্গে

সূচিপত্র

যাওয়া না-যাওয়া ৪৭, শব্দ যাকে ভাসায় ৪৭, মুহূর্তের দেখা ৪৮, তাকে ঐ দিনটি দাও ৪৯, আমাদের সক্রেটিস ৫০, আঙুলের রক্ত ৫১, স্বাধীনতার জন্য ৫১, উৎসর্গ ৫৩, কৈশোরের ঘরবাড়ি ৫৩, অর্ধনারীশ্বর ৫৪, সাদা পৃষ্ঠা ৫৫, চণ্ডালডাঙা ৫৬, ডাকপুরুষের দর্পণ ৫৭, হিরণ্ময় পাত্রখানি ৫৮, একটা উত্তর দাও ৫৯, জ্বর ৬০, দুটি মুখ ৬০, আর এক রকম জীবন ৬২, এলেম নতুন দেশে ৬২, স্বপ্নের অন্তর্গত ৬৪, কত না সহজ বলে ৬৪, দু' চারটে পলাতক ৬৫, আর যুদ্ধ নয় ৬৫, এবারের শীতে ৬৬, সুড়ঙ্গের ওপাশে ৬৭, আমরা এ কোন্ ভারতবর্ষে ৬৮, অন্ধ, গলা-ভাঙা, অভিমানী ৬৯, ঋণ থাকে ৭০, স্থির চিত্র ৭১, পালাতে পারবে না ৭১, শিল্প-সমালোচক ৭২, নদী জানে ৭২, এক এক দিন ৭৩, দেয়ালে নোনা দাগ ৭৪, ছবির মানুষ ৭৪, দিব্যি আছি ৭৫, নদীমাতৃক ৭৬, এত সহজেই ৭৮, যে আগুন দেখা যায় না ৭৮, আমার নয় ৭৯, ফেরা না ফেরা ৭৯, একমাত্র উপমাহীন ৮০, এ পৃথিবী জানে ৮১, মানুষের জন্য নয় ৮১, সে ৮১, দুই কবি: একটি কাল্পনিক সাক্ষাৎকার ৮২

যাওয়া না-যাওয়া

এদিকে ওদিকে বিপন্ন ঘর বাড়ি
স্রোতের কুটোয় কাকে রাখি কাকে ছাড়ি
ভালোবাসাময় চিঠিগুলি কুচি কুচি
ছিল লঘুমায়া, ধ্বংসে ছিল না রুচি
আসঙ্গ লোভী স্পর্শকাতর ডানা
যারা খুব চেনা তাদেরও কি ছিল জানা
সবুজ ভিখারী মরুভূমি চোখ টানে
পাহাড় মেত়েছে পতনের নির্মাণে
মেঘ তোলপাড়, পাগলাঘণ্টি হাওয়া...

আমার হলো না যাওয়া, যাওয়া হলো না, হলো না যাওয়া!

ব্যাকুলতা ছিল না-চাওয়ার চেয়ে বেশি
আগুন ও জলে যে-রকম রেষারেষি
কথা গেঁথে গেঁথে একটি অধিক কথা
আলিঙ্গনের ভেতরের শূন্যতা
পোড়াটে দুপুর জ্যোৎস্না জ্বালানো রাত
এ পথে সে পথে জানালায় করাঘাত
খুব খিদে পেলে বাতাসের আচমন
তেঁতুল পাতায় শুয়েছি সতেরো জন
কেউ ভালোবেসে চলে গেল খুব দূরে
কেউ বা অস্ত্র জলে ফেলে দিল ছুঁড়ে
কেউ বা মেনেছে স্বপ্নে চরম পাওয়া...

আমার হলো না যাওয়া, যাওয়া হলো না, হলো না যাওয়া!

শব্দ যাকে ভাসায়

শব্দ যাকে ভাঙে তাকে তুলোর মতন ভাঙে
ভাঙতে ভাঙতে ওড়ায় তাকে ধূপের মতন পোড়ায়
ঢেউয়ের মতো ভেসে বেড়ায় নীলিমা-ভাঙা ছবি

চোখের মধ্যে লাল ধুলোর প্রবাস উঁকি মারে
ঘরের মধ্যে ঘুরছে ফিরছে শরীরহীন জ্বালা
শব্দ যাকে খায় তাকে নদীর মতন খায়।

দ্যাখো দ্যুলোক শুয়ে আছে যৎসামান্য রোদে
এমন মায়া হাতে ছুঁলেই ভালোবাসার আঠা
আবার ফের পলক ফেললে কাচের মতন জল
জলের মধ্যে নারী এবং নারীর চোখে আগুন
কিংবা সবই দৃষ্টি-ভুলো শব্দ শব্দ খেলা
শব্দ যাকে ভাসায় তাকে সর্বনাশে ভাসায়!

মুহূর্তের দেখা

টিলার ওদিক থেকে উঠে এলে ওষ্ঠে ভরা
সারণীর কুলুকুলু ধ্বনি
আঁচলে বাতাস বাঁধা যেন সৌর তরণীর পাল
ভূমি থেকে এক ইঞ্চি উঁচু পায়ে দাঁড়ালে দিগন্তখানি জুড়ে
যেন কোনো স্বর্গ-বেশ্যা, অথবা প্রি-র‍্যাফেলাইট পরী...

কিছুদূরে গাছতলায় শুয়ে আমি পড়ছিলুম
মানুষের দাঁতের ইতিহাস
আগুনের বন্দিত্ব ও রুটি কাড়াকাড়ির দলিল
ঘাড় ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকি নিষ্পলক
ও কে? নীরা নয়? কিংবা বুঝি নীরার আদল
কোথা থেকে এলে, কেন এলে, ফের কোথায় পালাবে
শীত দুপুরের আলো সহসা রক্তিম হয়ে ওঠে
তরঙ্গের নানা স্তর, শূন্য ও অসীম, যেন চেতনার
লুকোচুরি খেলা

সবই তো অলীক তবু মুহূর্তের দেখাটাও ঠিক!

তাকে ঐ দিনটি দাও

সেই উজ্জ্বল দিনের শিয়র ছুঁয়ে আছে
চন্দনবর্ণ মেঘ
সারি সারি সার্থবাহ চলেছে প্রমাণিত স্বপ্নগুলি নিয়ে
গোধূলির সেকি অলৌকিক মায়াজাল
শব্দ উড়ে যাচ্ছে এক একটি যুঁই ফুলের মতন
বৃষ্টির শরীর নেই, তবুও সে আছে
এরই মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় সদ্য বলি দেওয়া
মোষের রক্ত ,
দৃশ্যটি সম্পূর্ণ হয়।

তারপর সেই দৃশ্য প্রসব করে তার নিজস্ব প্রতিভা
যেমন নদীর গভীরে গর্জে ওঠে কামান
মাতৃভূমি বিচ্যুত এক কিন্নরের শোকাশ্রুর মতন
কুসুমপাত হয় আকাশ থেকে
সমুদ্র নিশ্বাসে উড়ে যায় পরমাণু ধোঁয়া
ক্ষুধার্ত সত্যগুলি প্রতিশ্রুতির রক্ত মাংস চাটে
পা দিয়ে জল ভাঙার শব্দে ঢেকে যায়
কিছু কিছু ভুল
তখন পাহাড় থেকে নেমে আসে একলা এক পাথর
অন্য কোনো একাকীর কাছে।

উজ্জয়িনী থেকে সেই যে বেরিয়েছিল এক ভ্রাম্যমাণ
খুঁজতে খুঁজতে যার সব কিছু ছোট হয়ে গেল
এই শতাব্দী শেষের আকাশের নীচে
সে দাঁড়িয়ে আছে
চতুর্দিকে অপরিচ্ছন্ন ছায়া ও অবিশ্বাসী হাওয়া
তাকে ঐ দিনটি দাও
একটি দিন, একটি স্বপ্নের সার্থকতা!

আমাদের সক্রেটিস

ওয়েলিংটনের মোড়ে গোল আড্ডার মাঝখানে
দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের সক্রেটিস
তিনি একটু আগে হেমলক পান করে এসেছেন, আবার
পান করতে যাবেন।
প্রথমে তিনি ফরাসী ভাষায় উচ্চারণ করলেন
একটি সদ্য ভাঙা পাথরের ভেতরের যে রং
আজও কেউ তার নাম দেয়নি কেন?
তারপরই তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় জানালেন,
একমাত্র মেয়ে মানুষের গতরই ধারণ করতে পারে
একসঙ্গে দুটি আত্মা!

তারপর সক্রেটিস উঁচু করে তুললেন তাঁর দুই ডানা
জাদুকরের মতো তাঁর শরীর কালো আঙরাখায় ঢাকা
তাঁর অনামিকায় রামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত আংটি
তাঁর কণ্ঠে ফৈয়াজ খাঁর বাজখাঁই গমক
তিনি এবারে বললেন, চললুম উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দির থেকে
প্রদীপের ঘি তুলে আনতে
তোমরা অপেক্ষায় থেকো, ঘুমিয়ে পড়ো না।

বাতাসে ঝাঁপ দেবার আগে
কমলকুমার মজুমদার আমাদের দেখালেন
তাঁর বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের
নখদর্পণ।

টীকা: উনিশশো ষাট থেকে বাষট্টি সালের কথা। সেই সময় এই সক্রেটিস এসে দাঁড়াতেন ওয়েলিংটনের মোড়ে। সেখানকার ফুটপাথে ছিল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি আমাদের শেখাতেন কী করে বিষ হজম করতে হয়। তারপর আমরা ধার করে মুর্গীর ঝোল খেতে যেতুম। তিনি আমাদের অপেক্ষা করতে বলে একদিন চলে গেলেন। সেই মুর্গীর ধার আমাদের আজও শোধ করা হয়নি।

আঙুলের রক্ত

ঘর শব্দটি কবিতার মধ্যে এলে আমি তার দরজা দেখতে পাই না
অথচ দরজা শব্দটির একদিকে ঘর, আর একদিকে বারান্দা
বারান্দার পাশেই নিম গাছ
আমার শৈশবের নিম গাছের স্মৃতির ওপর বসে আছে একটা ইস্টিকুটুম পাখি

যদি ঐ পাখিটিকে আমি কখনো কবিতার খাঁচায় বসাই নি
শব্দের নিজস্ব ছবি তা শব্দেরই নিজস্ব ছবি
শরীরের শিহরন যেন মাটির প্রতিমার সর্বক্ষণ চেয়ে থাকা
যেমন পাথর ধুলো হয়ে যায় কিন্তু জল বার বার ফিরে আসে
কবিতায় কে যে কখন আসে জানি না
শুধু আমার আঙুল কেটে রক্ত পড়লে তা নিয়ে কবিতা লেখা হয় না!

স্বাধীনতার জন্য

স্বাধীনতা শব্দটি কৈশোরে বড় প্রিয় ছিল
যেন আবছা দিগন্তের ওপাশেই রয়েছে সেই
ভালোবাসার মতন শিহরনময়
এক গভীর প্রান্তর
বয়ঃসন্ধির মোড় পেরুলেই সেখানে পৌঁছে যাবো
সে কি অধীর প্রতীক্ষাময় রোমাঞ্চ ছিল তখন!

তারপর এলো সেই স্বর্ণময় দিন, এমন একটি
বিন্দুতে এসে দাঁড়ালুম
যার দু' পাশ দিয়ে আকাশ বিভক্ত হয়ে গেছে
সূর্যের সোনালি রশ্মি আশীর্বাদ জানালো
বৃষ্টি দিল সব গ্লানি ধুইয়ে

সবাই বললো এই তো বেশ পবিত্র ও প্রস্তুত হয়েছো
এবারে কয়েদখানার মধ্যে সুড়সড় করে ঢুকে পড়ো!

বাইশ বছরে পা দেবার পর দু'দিকে দু'কান ধরে
টান মারলো

জীবিকা ও সামাজিকতা

পৃথিবীটাকে যে-রকম চেয়েছিলুম তার ওপরে শুধুই কুয়াশা
যেন সব কিছুই আছে, ছুঁতে পারছি না
চেয়েছিলাম মানুষের মুক্তি, কিন্তু আমার হাতে পড়ছে বন্ধন
দূরত্বের আড়াল থেকে কেউ যেন ডাকছে, বুঝতে পারছি না ভাষা
ছোট ছোট আরাম, টুকিটাকি মোহজালে জড়িয়ে দিয়েছে সর্বাঙ্গ
এ রকম কথা ছিল না, এ রকম তো কথা ছিল না!
ক্রমশ একটা বয়েসে পৌঁছে মনে হয়
সামনের দিকে আর কিছু আশা করবার নেই
তবু একটা জেদী অহংকার জেগে থাকে
কার জন্য আশা? শুধু তো আমার জন্য নয়,
যারা নতুন জন্মেছে তাদের জন্যও

কিন্তু বিষণ্ণতা ছুঁয়ে থাকে নিজস্ব দেয়াল
গাঢ় অভিমানে মাঝেমাঝেই গলা চুপসে আসে
চারপাশে শুনতে পাই, প্রকৃত স্বাধীনতা নয়
শুধু স্বাধীনতা শব্দটির দেহতত্ত্ব নিয়ে
চলেছে তুমুল কলরব

মাঝে মাঝে ছেঁড়ার চেষ্টা করে পালিয়েছি
পাহাড়ে, জঙ্গলে, আদিবাসীদের আস্তানায়
কিছু একটা ভাঙার অস্থিরতায় নিজেকেই ভাঙতে চেয়েছি
বারবার
প্রত্যেকবারই কেউ ঝুঁটি ধরে টেনে ফিরিয়ে এনেছে
ঘুমপাড়ানি গানে বুজে গেছে চোখ
জেগে উঠে বুঝেছি, ওসব দু'দিনের মৌখিক ছদ্মবেশ
বুক টনটন করে উঠেছে
মেনে নিতে চাইনি, মনে হয়েছে, আছে, আছে, পথ আছে!

পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরে দেখি
স্বাধীনতার পোশাকপরা অস্ত্রধারীদের মহড়া
আমার মন খারাপ আমি কেমন করে বোঝাবো
তবে কি এ পৃথিবী পরিপূর্ণ ধ্বংসের পর
প্রকৃত স্বাধীন হবে?
আমি একজন কিশোরের দিকে তাকাই, সেও
স্বপ্ন দেখতে ভুলে যায়নি তো?

উৎসর্গ

এই নাও আমার সমস্ত দৃষ্টিপাত
এই নাও সকালের সুখ
এই নাও আশৈশব অতি প্রিয় শব্দগুলি
এই নাও সার্থকতা বাতাসে উড়ন্ত বালিহাঁস
এই নাও কৈশোরের একান্ত নিভৃত শিহরন
এই নাও পাহাড়ী রাস্তার মতো প্রেম
এই নাও প্রবাসের চিঠি
এই নাও , রোদ্দুরে-বৃষ্টিতে গড়া মণিহার
এই নাও নশ্বর রুমাল
এই নাও নদীর স্রোতের মতো সব প্রতিশ্রুতি
এই নাও কালি কলমের বিষণ্ণতা
এই নাও ক্ষমাপ্রার্থী করযুগ
এই নাও বুক ভর্তি তরল আগুন
এই নাও বৈশাখী ঝড়ের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষা
এই নাও উজ্জ্বল ব্যর্থতা
এই নাও ভাঙা সুটকেশ ভরা সকল ঐশ্বর্য
এই নাও অরণ্যের হাতছানি
এই নাও অসংখ্য দরজার উন্মোচন
এই নাও শরীরের সব কান্না
এই নাও ছুটি
এই নাও তিলে তিলে জমানো মমতা
এই নাও স্মৃতি ও বিস্মৃতি
এই নাও মৃত্যুর মুহূর্ত
এই নাও স্বর্গের পতাকা...

কিছু দেবে?

কৈশোরের ঘরবাড়ি

নদীর কিনারে ছিল মাটির মমতা মাখা
কৈশোরের বাড়ি
একই লপ্তে বাঁশবাগান। বেগুন-লঙ্কার কুচো খেত

পবিত্র শূন্যতা ছিল চারদিকে, কিছু কিছু ঘাস ফুল ছিল
রাত্রির বাড়িটি ছিল দিনের বেলার বহুদূরে
কখনো অদৃশ্য, ফের চাঁদের উদ্যোগে ভাসমান
কিসের সৌরভ যেন ঘুরে যায় সন্ধেবেলা, ঠিক যে-সময়
নদী ডাকে
আকাশ-বাঁধানো তীর, সন্ন্যাসীর মতো এক নদী
কোথায় যে যাবে বলে বেরিয়েছে, নিজেই জানে না।

কৈশোরের মাঠকোঠায় ছিল না একটুও সোনা,
ইস্পাত, বারুদ
সদ্য রূপকথা ভেঙে জেগে উঠছে মন কেমন করা এক দেশ
পিছনে অস্পষ্ট ধ্বনি, মেঘ-ছেঁড়া চকিতের ছবি
গ্রীষ্মের বাতাসে ভাসে জামরুল ফুলের মিহি কণা
যেন মোহময় মিথ্যে, একা একা জল নিয়ে খেলা
লম্বা গাছটির ডালে এক এক দিন এসে বসে
অবাক অবাক চোখ প্যাঁচা
মৃদু বৃষ্টি, শব্দের জোয়ারে তার ভুরুক্ষেপ নেই
অজস্র সুতোর জাল বাতাস ছড়িয়ে যায় বাতাসের মনে
ধিক্‌ধিকে ক্ষিধের মতো সবদিকে প্রতীক্ষার তীব্র ব্যাকুলতা
লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে মা যাচ্ছেন
কাঁচা রান্নাঘরে
কুপির আলোয় কাঁপে ছোট্ট একটি সংসারের ছায়া
আবার মিলিয়ে যায়, ঝড় ওঠে অতি প্রিয় ধ্বংসের আওয়াজে
আচমকা ঘুম ভেঙে শোনা যায় রুদ্র সন্ন্যাসীর নিশি ডাক।

কৈশোরের ঘরবাড়ি নদীর কিনারে
আজো রয়ে গেছে।

অর্ধনারীশ্বর

নদী বন্ধন উদ্বোধনে এসেছেন এক নৃমুণ্ড শিকারি
গোলাপের পাপড়ি উড়ছে বাতাসে, এখানে শিশুরা হাসে না
এখানে শঙ্খধ্বনি ও সমর ভেঁপু এক সঙ্গে মিলে মিশে যায়

ক্ষ্যাপাটে জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে
এগোচ্ছেন তিনি, ঝুঁকলেন
তাঁর ওষ্ঠে ফুটে উঠছে পাহাড়ী হাসি, কপালে আন্তর্জাতিক ভাঁজ
আসলে তিনি সেতুর নীচে গুঁজে দিচ্ছেন বারুদ
জল বা মাটির মানুষেরা যা জানে না, তিনি তা জানেন
লম্বা হত্যা তালিকার নীচে স্বাক্ষর বসিয়েই তিনি ছুটলেন
বিমানের দিকে
জানলার বাইরে মেঘের মাধুরী তাঁর পছন্দ হলো, তলোয়ারের মতন বিদ্যুৎ
বিভা
তাঁকে যৌন স্মৃতি দিল
হাত বাড়িয়ে তিনি সেবিকার হাত থেকে নিলেন নিজের সন্তানের লহু
তাঁর দুই উরুর অন্তবর্তী আগ্নেয়গিরি জেগে উঠলো, স্বপ্নে।

নির্জন দ্বীপের বাতি-ঘরের শিখরে তার বসতি, তিনি অর্ধনারীশ্বর
দেয়ালে ঝুলছে মালার পর মালা, সব সহাস্য স্থির মুখ
তিনি পোশাক খুললেন, তাঁর বুকে পিঠে সাংবিধানিক মারপ্যাচের
কালসিটে
বাঁ হাতের তালুতে লেখা বাণী, রাষ্ট্র, সে তো আমি!
লোহার গরাদ আঁকড়ে ধরে তিনি দেখতে লাগলেন
অন্ধকার গোলাকার সিঁড়ি
আর কেউ কি উঠে আসছে, শোনা যাচ্ছে অন্য পদশব্দ?
নীচে কি ধাক্কা মারছে জোয়ারের ঢেউ না লক্ষ লক্ষ ফিসফিসানি
তাঁর ঘুম আসে না, তাঁর চোখে জল আসে
তাঁর দীর্ঘশ্বাসে ভরে যায় স্মৃতিকথার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা
পার্থিবদের পরমার্থ-মহাযজ্ঞে তিনি প্রাণপাত করে চলেছেন
কেউ তা বোঝে না, কেউ তা বোঝে না!

সাদা পৃষ্ঠা

সাদা পৃষ্ঠা, তুমি এক দৃষ্টিতে আমার দিকে
তাকিয়ে রয়েছো কেন
আমি কি সমুদ্র দ্বীপের মতন হঠাৎ অচেনা
পাঠশালার প'ড়োর সঙ্গে বিমান-বন্দরে দেখা

সাদা পৃষ্ঠা, তোমার সঙ্গে কি আমার যৌন সম্পর্ক
হয়েছিল কোনদিন?

সমস্ত কিছুই হারিয়ে যেতে যেতে একটা কিছু
আঁকড়ে ধরার মতন
বিষণ্ণ বেলায় এক প্রান্তে এসে আমি দাঁড়িয়েছি
ঝড় এসে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে ফুল
খেলাচ্ছলে কেউ অন্ধকার নিয়ে এলো
স্কুল বাড়ির ছাদে
শুকনো নদীর মতন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে শহরের রাস্তা
এর মধ্যে তুমি কেন আমার সামনে নিয়ে এলে
তোমার বৃষ্টিস্নাত মুখ
সাদা পৃষ্ঠা, চলো, তা হলে তোমার সঙ্গেই দেশান্তরে যাই!

চণ্ডালডাঙা

মনে করো এখানে কিছুই নেই, একটা চণ্ডালডাঙা
তারও ভেতরে কোথাও রয়েছে
এক টুকরো হারানো ভালোবাসা
তাই খুঁজতেই তো আসা এখানে, এই ঠা-ঠা দুপুরে
আরও কার কার যেন সঙ্গে আসার কথা ছিল
মাঝপথে তারা খসে পড়লো টুপটাপ
তারা অনেকেই নিশ্চয়ই পেয়ে গেছে অনেক কিছু
কেউ হয়তো চড়ে বসেছে একটা লম্বা গাছের ডগায়
খুব আরামে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে কর্মফল
কেউ বা ঝাঁটা হাতে নেমে গেছে সমাজ সংস্কারে
কেউ ব্যাধ সেজে উপেক্ষা করেছে প্রতিষ্ঠা
যেখানে কিছুই নেই, এমনকি ভালোবাসাও হারিয়ে গেছে
সেখানে আর কেই-বা আসবে।

একটা বেশ চমৎকার গোলোকধাম খেলা জমে উঠেছিল
নিজেরই আদলে গড়া মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলতে ফেলতে
হাতে বিঁধেছে টুকরো টুকরো স্মৃতি
খিদে তেষ্টা পেলেই গলায় ঢেলে দিয়েছি উচ্চাকাঙ্ক্ষা

নেশার জন্য তো ছিলই প্রচুর অহমিকা
জল ও আগুনের মধ্যে যে ধর্মযুদ্ধ চলেছে অবিরাম
তা আমরা লঘু প্রতীকে ছড়িয়ে দিয়েছি
বিছানায়, নিম্ন শরীরে
সূর্যাস্তের মতন বর্ণাঢ্য উল্লাস ছড়িয়েছে ঘুমের শিখরে
রাতপাখি যেমন অন্ধকারকে বাঙ্ময় করে
সেই রকম আমরা খরচ করেছি সঞ্চিত স্তব্ধতা
কেউ যাতে আচমকা এগিয়ে যেতে না পারে
তাই যখন তখন উল্টো দিকে ফিরে শুধু করেছি পিঠ-দৌড়।

একদিকে পাহাড় জঙ্গল, অন্য দিকে নদী-সমুদ্রে
ছিল প্রচুর ডাকাডাকি
দিক শূন্য কাশ ফুলের ওড়াউড়ির মতন হৃৎস্পন্দন
তারই মধ্যে একটি বেদনার রেখা টিট্টিভের ডাকের মতন
তীক্ষ্ণ
উড়ে যায় দিগন্ত ছাড়িয়ে শূন্যতায়
যেন লিখতে লিখতে হঠাৎ শব্দ-রোধ
অতল কালো গহ্বর, একটি বুলেটের আওয়াজ
যেন সহাস্য দীপাবলির মধ্যে অকস্মাৎ যৌন-ধিক্কার
যেন কঠিন সত্যকে চাওয়ার বদলে রক্তের উত্তর
তখন একবার যেতে হয় সেই চণ্ডালডাঙায়
যেখানে আর নেই, কিছু নেই
মধ্যদুপুরে নিজের ছায়াও পড়ে না
সেখানে এক টুকরো ভালোবাসার জন্য খোঁজাখুঁজি
যেন হারিয়ে যেতে যেতে, হারিয়ে যেতে যেতে
জলের মধ্যে, জল-শৈশবের মধ্যে হাত পা ছড়িয়ে
কোমল ফিরে যাওয়া।

ডাকপুরুষের দর্পণ

এই প্রান্তরের উড়াল ছাড়িয়ে যে অন্য প্রান্তরের শূন্যতা
সেখানে কেউ কেউ শুয়ে থাকে
আমি তাদের চিনি না, ডাকপুরুষ চিনতেন।

গড় মন্দারন পেরিয়ে কারা যেন রাতের সমূহ অন্ধকারে
চুপচাপ চলে গেল
কে জানে তারা আর কোনদিন ফিরে এসেছিলো কিনা

মাংসের মতন কাঁচা মাটি উঠে আসছে কোদালের ঘায়ে
একজন বোবা মতন ঝুঁকে পড়া মানুষ
সেখানে ঘাম ফেলেছে, ফেলতে ফেলতে গলে গেল সম্পূর্ণ

গানের ইস্কুলের পর কোঁকড়া চুল এক রহস্যময়ী কিশোরী
ঢুকে যায় পোড়ো বাড়িটার মধ্যে
একবার মাত্র পেছন ফিরে সে তাকায়, পর মুহূর্তেই অদৃশ্য

মাঝে মাঝে আমি দেখতে পাই মধ্যযামে নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে
দুই দীর্ঘ বাহু তুলে
ডাকপুরুষ ওদের সকলের জন্য দর্পণ দেখাচ্ছেন।

হিরণ্ময় পাত্রখানি

হিরণ্ময় পাত্রখানি এতটা উত্তপ্ত কেন
ধরে রাখা যায় না আঙুলে
অতৃপ্তি-দণ্ডিত ওষ্ঠ দূরে যেতে গিয়ে
পুড়ে যায় মুহূর্তের ভুলে।

একাকী অরণ্যে যেন তাঁবু গেড়ে শুয়ে থাকা
কিছু নেই, দুনিয়া রয়েছে
হাড়-পাজরা ফুঁড়ে আসে ক্ষুধার কিরণ ছটা
টের পাই, তবু সুখ বেঁচে।

এ যেন রঙের কৌটো, ফুরোলেও লেগে থাকে
সেই বোধ, টুকরো ইতিহাস
বাসাংসি জীর্ণানি বলে যারা শ্লোক বেঁধেছিল
রয়ে গেছে তাদেরও নিশ্বাস।

হিরণ্ময় পাত্রখানি সহসা লুকিয়ে যায়
অথচ আমারই জন্য ওকে
সমস্ত সমুদ্র ছেঁচে বড় কষ্টে আনা হলো
এখন বিভ্রম জাগে চোখে।

একটা উত্তর দাও

প্রশ্ন করলেই তুমি প্রশ্ন ফিরিয়ে দিও না
একটা উত্তর দাও!
যা কিছু চলে যায় সবই পলিমাটি রেখে যায় না
তোমার বুক ছুঁয়ে দেহে যায় যে বাতাস, তা আমার নিশ্বাস নয়
কেনই বা তা হবে, সারাটা জীবন কি জারুল বাগানে ছেলেমানুষী?
একটা উত্তর দাও!

নর্তকীর পায়ের ব্যথার মতন একটি ব্যর্থ সন্ধ্যা
গড়িয়ে যায় ঝিম ধরা মাঝ রাত্তিরের দিকে
ফাঁকা মাঠে তালগাছের ডগায় উড়ছে চাঁদের ঝাণ্ডা
দলপতির মতন রাশভারি একটি কেঁদো ইঁদুর হঠাৎ থেমে গিয়ে
ডান পাশের নীরবতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে
কিসের প্রতীক্ষায় কাঁপতে থাকে তার মুখের সূক্ষ্ম রোম
পোকা-মাকড়দের সংসারে চলেছে অবিরাম সুখ-দুঃখ
এই-সব-কিছুর মধ্যে শোনা যায় অবিকল একটি অজ্ঞাত শিশুর কান্না
কবিতার খাতাতেই শুধু ফুটে ওঠে এই দৃশ্য, তারপর তা বাস্তব
যেন কিছুটা মায়াজাল ছেঁড়ার মতন এই অতি প্রকৃতি
অন্য কোনো ব্যাকুলতা, অন্য কোনো স্মৃতির চাতুরি।

অসংখ্য সমান্তরালের মধ্যে একটি অশ্বক্ষুর ধ্বনি
পরিকীর্ণ শূন্যতার মধ্যে দুলতে থাকে
বিদ্যুৎ-ছটায় অদৃশ্য হয়ে যায় টুকরো টুকরো অরণ্য
বেদনার দানার মতন আলো ভেঙে ভেঙে গড়িয়ে পড়ে
বয়ঃসন্ধির আঠা
সশরীর ঢেউগুলি পরস্পরকে ঝাপটা মেরে
মুহূর্তে বিমূর্ত হয়ে যায়
কেউ ডাকে, কেউ ডাকে
অসংখ্য সমান্তরালের মধ্যে দোলে অশ্বক্ষুর
একটা উত্তর দাও!

জ্বর

এমনই রোদের তাপ, লেগে গেল শীত
গুটি গুটি চলে যাই কম্বলের নীচে
একবার উপুড় হই, পুনরায় চিৎ
উত্তর মেরুর স্রোত সূর্যের পিরিচে।

ইজেরের বাল্যকাল ডোবে অভিমানে
আর একটি কম্বল তবু থামে না কাঁপুনি
আকাশে সংঘর্ষ হলো ঈগলে বিমানে
আমি শুধু পিঁপড়েদের পদশব্দ শুনি।

বাঁ হাতকে ডান হাত দেখে নেয় খুঁজে
মনে হয় মাথা ছাড়া কিছু নেই আর
মাথাটিও রাখা হলো কেল্লার বুরুজে
কামানের গোলা হয়ে ফাটাবে আঁধার।

কপালে মায়ের হাত জলের নরম
অকস্মাৎ মা মা গন্ধ ভরে যায় ঘর
এই গন্ধে ভয় আছে, স্নেহ যেরকম
কখনও নির্দয় হয়ে তোলে ঘূর্ণিঝড়।

গভীর সমুদ্র বুঝি, তাই এত নীল
দু'পায়ে পাথর বাঁধা, হু হু নীচে নামে
বন্দি দেবতার সঙ্গে অবিকল মিল
পাতালের দিকে যাই প্রগাঢ় আরামে।

দুটি মুখ

একজন দেখলো শুশুনিয়া পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে পড়া চাঁপা রঙের বিকেল অন্যজন বললো, এত নিরন্ন মানুষ, এত হাহাকার, তবু মানুষ পিকনিক করতে আসে?

একজন শুনলো লুণ্ঠিত স্বর্ণ সিংহাসন ফিরে পাওয়ার মতন যৌবনের জয়ধ্বনি
অন্যজন বললো, দুটো ভিখিরি বাচ্চার সামনে ওরা মুর্গীর মাংস চুষে চুষে খায় কী করে?

একজন দেখতে পেল ঘোড়সওয়ারের মতন আকাশ ভেদ করে ছুটে যাচ্ছে এক ঝাঁক শঙ্খচিল
অন্যজন বললো, ওগুলো সব শকুন, এত শকুন, গ্রামের পর গ্রাম এখন গো-ভাগাড়

একজন দেখলো নন্দলাল বসুর ছবির মতন এক সাঁওতাল কিশোর, সঙ্গে মূর্তিমান আদরের মতন একটা ছাগলছানা
অন্যজন বললো, ভূমিদখলের ষড়যন্ত্রে আদিবাসী সরল মানুষেরা এখন শিকড়হীন ক্রীতদাস

একজন দেখলো পাখিরা ফিরে আসছে স্নেহ মমতার সংসারে, বাতাস বিলিয়ে যাচ্ছে জঙ্গলের গন্ধ
অন্যজন বললো, কাজহীন মজুরদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে চোরাকারবারিরা উজাড় করে দিচ্ছে বনসম্পদ

একজন আপন মনে উচ্চারণ করলো, উদাসীন সৌন্দর্যময়ী এই পৃথিবী, মানুষ কেন মানুষকে আনন্দের ভাগ দেয় না?
অন্যজন ঘোষণা করলো, চতুর্দিকে জেগে উঠছে নিপীড়িতের দল, উঁচু হয়েছে মুষ্টিবদ্ধ হাত,
সমাজবদলের দিন আসন্ন!

তারপর পলায়নবাদীর মতন একজন একটা নিরালা গাছতলা খুঁজে নিয়ে শুয়ে রইলো চুপচাপ
অন্যজন জিপ গাড়ি চেপে চলে গেল ডাকবাংলোতে জেলা অফিসারদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে
বুকে-দাগা ইতিহাস নিয়ে দিগন্ত ঢেকে জেগে রইল শুশুনিয়া পাহাড়
নিঝুম নিরেট অন্ধকারে অস্তিত্ববিহীনভাবে ডুবে গেল গ্রামবাংলা...
আবার কি ওদের দু'জনের দেখা হবে কোনোদিন
হাতে হাত মিলিয়ে বুঝবে পরস্পরের সত্য
একসঙ্গে গিয়ে দাঁড়াবে মানুষের সামনে?

আর এক রকম জীবন

দমকা হাওয়ায় এক ঝাঁক পায়রার মতন
উড়ে গেল আমাদের সামার ভ্যাকেশান
বর্ষায় ধুয়ে গেল প্রথম কবিতা লেখার দুঃখ
তলপেটে তীব্র ব্যথার মতন অতি ব্যক্তিগত সেই কবিতা
পুকুরের নীল রঙের মধ্যে পুঁটি মাছের চকিত রুপোলি
আভার মতন
প্রথম প্রেম কিংবা প্রথম প্রেমের মতন কিছু
ঝড়ের দাপটে নুয়ে পড়া সুপুরি গাছের মতন
বুকের মধ্যে একটা বাধ্যতামূলক ব্যর্থতাবোধ
প্যান্টের পকেটের ফুটো দিয়ে হারিয়ে যাওয়া আধুলির মতন
নিভা মাসির বাড়ি থেকে একা একা ফিরে আসা সন্ধ্যা
নাজির সাহেবের ঘুড়ির দোকানে আগুন লাগার মতন
মাঝরাতের চিঠি-ছিঁড়ে-ফেলা হাহাকার
সকালবেলা ঘুম ভেঙে ওঠবার পর সব কিছুই অন্যরকম
আকাশের গায়ে শুয়ে আছে মানস সরোবর
ট্রাম লাইনের ওপাশে জেগে ওঠে পাহাড়
বুঝতে পারি এতদিনের চেনা জগৎ রং বদলাচ্ছে
আমার শরীরের মধ্যে জেগে উঠছে আর একজন
নাম-না-জানা মানুষ

ছুটি ফুরিয়ে যাবার পরবর্তী আর এক রকম জীবন!

এলেম নতুন দেশে

এ কোন্ নতুন দেশে বেড়াতে এলুম যেখানে সব কিছুই
খুব চেনা চেনা মনে হয়

এই সব উজ্জ্বল লাল চেহারার গাছ আমাদের পাড়াগাঁর
উঠোনতলা আলো করে থাকতো

ছোটবেলা পেরিয়ে আসার আগেই অবশ্য তারা ঝড়ে মুড়িয়ে গিয়েছিল
হাওয়ায় উড়ছে জল-রঙা কুচি কুচি ফুল, ঠিক যেমন দেখেছিলাম
ছোট পিসিমার পাহাড়-ঘেঁষা বাড়িতে
ছোট পিসিমা অগ্নিপরীক্ষার জন্য ঝাঁপ দিয়েছিলেন
আর ফিরে আসেন নি
এই যে দেখছি প্রত্যেকটি পুকুরেই জলস্তম্ভ
এ আর নতুন কথা কী
সেই যে আমাদের প্রথম রেলগাড়ি চেপে পশ্চিম ভ্রমণ
সেবারে আমরা মুহুর্মুহু দেখতে পেয়েছিলুম আকাশগঙ্গা
আবার কোথাও কোথাও মাঠের মধ্যে এক একটা জল-পদবী
উঠে গেছে স্বর্গের দিকে
সেই সেবারেই তো বাবা অন্ধ হয়ে গেলেন, স্পষ্ট মনে আছে
রেলের ইঞ্জিন ড্রাইভার নেমে এসে মায়ের বাহু ছুঁয়ে
বলেছিলেন,
আমি মিত্তিরবাড়ির অতুল...

এই নতুন দেশের রাস্তাঘাটগুলো আলিঙ্গনের জন্য
হাত বাড়িয়ে আছে
কী সহজ সরল অনুবাদে হেসে উঠছে মুখ মনে-না-পড়া
বাল্যসঙ্গীর মতন মানুষেরা
গৃহগুলির ঘুরন্ত সিঁড়ি দিয়ে অনবরত উঠছে নামছে
অনেকগুলি চপল পা
ঠিক যেন নেমন্তন্নবাড়ি, এখনো কেউ কেউ আসে নি
শানাই বাজছে না বটে, তবু কোনো একটি সুরলহরী
ঢেকে দিচ্ছে কান্নার শব্দ
এ রকম কতই তো রোশনি ঝলমল উৎসবের পাছদুয়োরে
আমি দাঁড়িয়ে থেকেছি
এ কেমন অচেনা রাজ্য যেখানকার প্রতিটি নারীর মুখই
আগে ছবিতে আঁকা হয়ে গেছে
আমার বুক পকেটের এক একটি ছবি আমি মিলিয়ে মিলিয়ে
দেখি
সব মন পড়ে যায়!

স্বপ্নের অন্তর্গত

কারুর আসার কথা ছিল না
কেউ আসে নি
তবু কেন মন খারাপ হয়?
যে-কোনো শব্দ শুনলেই বাইরে উঠে যাই
কেউ নেই—
অদ্ভুত নির্জন হয়ে শুয়ে আছে পৃথিবী
ঘুম ভাঙার ঠিক আগের মুহূর্তের স্বপ্ন নিয়ে...
আমিও কি সেই
স্বপ্নেরই অন্তর্গত?

কত না সহজ বলে

কত না সহজ বলে ভাবা গিয়েছিল
যেমন সহজ ঐ সতেরোই আশ্বিনের সকালের মেঘ
যেমন সুন্দর, শুভ্র, পাতা ঝরা—অবিশ্বাস
নরকের দিকে চাই, মনে হয় এই সেই স্বপ্নময়
লুপ্ত আটলান্টিস
অন্বিষ্ট নদীর কূল, ঢেউ ডানা মেলে আসে, রুপোলি পালকে
সব আধো আধো চেনা
নিষিদ্ধ দক্ষিণ দেশ দ্বার খোলে, ঝলসে ওঠে প্রিয় হাতছানি
কত না সহজ বলে ভাবা গিয়েছিল।

এদিকের খেলা ভেঙে ওদিকের আগুন জ্বলেছে
বনবাস শেষ করে কেউ ফিরে আসে, কেউ
ক্রমশ দুর্গমে চলে যায়
চৌচির ঘরের মধ্যে পড়ে আছে পাণ্ডুলিপি, জীর্ণ মখমল
উরু-সম্মিলনে স্বেদ, জন্ম থেকে জন্মান্তর খোঁজা
সখেদ বন্যার জল, ভেসে যায় সেতুর স্থপতি
সবুজের গায়ে লাগে রক্ত, অসংখ্য হাতের মধ্যে
ভুল বিনিময়...

কত না সহজ বলে ভাবা গিয়েছিল!

দু'চারটে পলাতক

যেদিকে যাবার কোনো পথ নেই, সেই দিকে
ছুটে যাওয়া ছিল আমাদের প্রিয় নেশা
শুকনো নদীর ধারে কাঁটা জংলা, আমূল খাড়াই
কেন এতো ভালো লেগে গেল
গহন রাত্রির বন, একদিকে বিন্দু বিন্দু আলো, দূরে
প্রগাঢ় নৈরাজ্য
তবু কেন সেই আলো পিছু টানলো না?
অন্ধকার নিয়ে গেল, অন্ধকার ভরে গেল হিমে!

সব পথ খোলাখুলি পৃথিবী তো এমনই নিষ্পাপ
যে একা হারিয়ে যেতে চায়, যাক, মানুষেরই
এই স্বাধীনতা
অথচ সবাই বলবে এ জীবন মানচিত্রে গাঁথা
ফিরে এসো, সুস্থ সমাজের জন্য পেতে দাও ঘাড়

যে কথা হাজারবার বলা হয়ে গেছে তাই
পুনঃ পুনঃ বলো
শৌখিন সন্ধ্যায় যাও রঙ্গালয়ে, দারিদ্র্যের জন্য দাও
করতালি ধ্বনি
সকলের সঙ্গে তুমি পায়ে পা মেলাও

দু-চারটে পলাতক তবুও বাইরে ছিটকে
লিখে যাবে অর্থহীন, ব্যক্তিগত, অকেজো কবিতা।

আর যুদ্ধ নয়

'কার দিকে তুমি গুলি ছুঁড়ছো হে, এখানে সবাই মানুষ!'
তুমি কে, তুমি কি গ্রহান্তরের দল-ছুট?
তোমার কখনো ছিল না কি শৈশব?
তুমি কি কখনো দেখোনি মাটিতে ঘুমন্ত কোনো শিশু?
জানলার ধারে দাঁড়ানো, একলা, শূন্যদৃষ্টি নারী?
কার দিকে তুমি গুলি ছুঁড়ছো হে, এখানে সবাই মানুষ!

নামাও রাইফেল
এ পৃথিবী তোমার একলার নয়
এ পৃথিবী লোভের, ঘৃণার, উন্মত্ততার নয়
আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছে, আমি তোমার দিকে
আর তাকাতে পারছি না।

কী গভীর নিঃশব্দ বন চারদিকে
ওরা জানে, ওরা সব দেখেছে।
ধোঁয়ায় গ্রাস করছে নিষ্পাপ বাচ্চা ও ব্যাকুল মহিলাদের
ক্ষুধার্ত ও বঞ্চিতদের দিকে উদ্যত মুষ্টি তুলেছে যারা
তারা কে?

কার দিকে তুমি গুলি ছুঁড়ছো হে, এখানে সবাই মানুষ!

ল্যাটভিয়ার রিগা শহর থেকে তিরিশ মাইল দূরে, জঙ্গলের মধ্যে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। সেখানে দাঁড়িয়ে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম, আমার মতন কঠোর লোকেরও কান্না এসে গিয়েছিল। চল্লিশ বছর আগে ঐ স্থানটিতে আশী হাজার শিশু-বৃদ্ধ-নারী-পুরুষকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। আমি কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের অনেক বর্ণনা আগে পড়েছি। কিন্তু বইতে পড়া আর নিজে সেরকম কোনো স্থানে উপস্থিত হওয়ার মধ্যে উপলব্ধির অনেক তফাৎ। সেখানে দাঁড়িয়ে আমার হঠাৎ মনে পড়ল, একটি বিখ্যাত চেকোশ্লোভাক যুদ্ধ-বিরোধী উপন্যাসের লাইন, "কার দিকে তুমি গুলি ছুঁড়ছো হে, এখানে সবাই মানুষ!" বাকি লাইনগুলি সেই অনুসঙ্গে লেখা। হয়তো ঠিক সুললিত কবিতা হলো না। কিন্তু লাইনগুলি এই ভাবেই আমার মনে এসেছিল। ঠিক সেইরকমই লিখে গেছি।

এবারের শীতে

এবারের শীতে নিরুদ্দেশের ওপারে
কথা দেওয়া আছে যেতে হবে একবার
যেখানে জলের বুক ভরে গেছে আগুনে
যেখানে বাতাস পাথরে লিখেছে মায়া।

এখন গ্রীষ্মে শ্রমের বিষম আড়াল
যেদিকে তাকাই পূর্ণতা জুড়ে খাঁ খাঁ

যেসব রাস্তা ডুব দিয়েছিল নদীতে
তারা ফের উঠে গা ঝাড়া দিয়েছে রোদে।

এবারের শীতে গৃহ-জঙ্গল ছাড়িয়ে
ক্লান্তি কলুষ তমসার জলে ধুয়ে
যেখানে অজানা রচেছে আপন নিরালা
কথা দেওয়া আছে, যেতে হবে একবার!

সুড়ঙ্গের ওপাশে

সুদীর্ঘ সরল একটা সুড়ঙ্গের ওপাশে একটু একটু আলো
কয়েকটি ছায়ামূর্তি হাত-পায়ের ন' দশ রকম
ভঙ্গিমায় খুব ব্যস্ত
অন্ধকারের গায়ে বিদ্যুতের মতন রং, ওরা কাকে ডাকে?
শব্দহীন এক উল্লাস, যেন মুক্তির হাতছানি
আমি কি অত দূরে যাবো, না পিছনে ফিরবো ?

মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য এই দৃশ্য, তারপরই পর্দায়
অন্য ছবি
বই ঘেরা ঘর, টি. ভি., টেলিফোন, মদের গেলাসের সামনে আমি
বাইরের কাটাকুটি রাস্তায় ঝলমলে আলোতে কোলাহল করছে
শহুরে রাতের পৌনে আটটা
ব্রিজ পেরিয়ে মফঃস্বল পর্যন্ত কংক্রিটের টংকার
মানুষের গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষিতে উৎপন্ন হচ্ছে তাপবিদ্যুৎ
আবার এরই মধ্যে চার-দেয়াল ঘেরা একাকিত্ব
অথচ মন খারাপ নেই, মিহিন বৃষ্টির গুঁড়োর মতন
দেখা যায় না এমন ঔদাসীন্য...

সুড়ঙ্গের ওপাশে ওরা ডাকে, ওরা ডাকে...

আমরা এ কোন্ ভারতবর্ষে

আমরা এ কোন ভারতবর্ষে আছি উনিশ শো চুরাশিতে?
লজ্জায় আমার মাথা ঝুঁকে পড়ে
রাগে সারা গায়ে জ্বালা ধরায়
দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয়
চিৎকার করে উঠতে চাই কর্কশ গদ্য ভাষায়
আমরা এ কোন্ ভারতবর্ষে আছি...

পরিসংখ্যানে শুনি এদেশে সকলের জন্য খাদ্য আছে
কান্‌কুন সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী গর্বের সঙ্গে বিশ্ববাসীকে বলেছিলেন
ভারত আর অন্নভিখারী নয়
তবু এ দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ দু'বেলা খেতে পাওয়ার
স্বপ্নও দেখে না
বাঁধের ওপর আমরা বসে থাকতে দেখেছি
ক্ষুধার্ত শিশুর পিতাদের অসহায় আলগা শরীর
আমরা শহরের ফুটপাথ দেখেছি, গ্রামের গঞ্জ, বাজার
হাটখোলা দেখেছি
আমরা পার্ক স্ট্রিট, বড়বাজার, ওয়াটগঞ্জ দেখেছি
আমরা রাইটার্স বিল্ডিংসের পালাবদল দেখেছি
আমরা দাক্ষিণাত্য ও উত্তরাপথ জুড়ে
নপুংসকদের কষের ফেনা গড়াতে দেখেছি
এ কোন্ ভারতবর্ষে আমরা...

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসকদের নিন্দে করার
কোনো অধিকার আমাদের নেই
কারণ, এদেশে হরিজনদের যখন তখন আমরা
পুড়িয়ে মারি
মার্কিন দেশের বর্ণবিদ্বেষ তো কিছুই না
এদেশের কালো মেয়েদের এখনো টাকার ওজনে
বিয়ে হয়
কিংবা হয় না
কিংবা, পরে তারা গায়ে কেরোসিন ঢালে
আমেরিকা রাশিয়ার পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কার চেয়েও ভয়ঙ্কর
আমাদের আত্মপ্রতারক, খালি হাতের,
লাঠি, ছুরি, বোমার গৃহযুদ্ধ

এখনো মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, গুরুদ্বারে বিকট ধ্বনি ওঠে
ধর্মের নামে রাস্তায় রাস্তায় রক্ত
আঃ, ধর্ম শব্দটি একদা কত সুন্দর ছিল, এখন
পুঁজ-রক্ত আর স্বার্থপরতায় মাখা
ধর্ম তো আফিম নয়, জাতীয়তাবাদ নয়,
ব্যক্তিগত শুদ্ধি নয়
শুধু ভেড়ার পালের পরিচালকদের উন্নত লাঠি
আমি দ্বিধাহীন ভাবে শতসহস্র নিঃশব্দ প্রতিবাদকারীর সঙ্গে
কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চায়
যে হিন্দু স্বার্থপরের মতো রোজ পুজোআর্চায় মাতে
যে মুসলমান পারিপার্শ্বিকের প্রতি চোখ বন্ধ করে রোজ পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ে
যে খ্রিস্টান অন্য ধর্মের মানুষদের অধঃপতিত মনে করে
যে শিখ শুধু ধর্মের দাবিতে রাজনৈতিক অধিকার চায়
তারা শুধু আত্মপ্রবঞ্চক নয়, তারা অধার্মিক, তারা খুনি
প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে তারা মাতৃহত্যা, শিশুহত্যার
জন্য দায়ী
তারা যে অপরের হাতে ক্রীড়নক সেটুকু বুঝবার
ক্ষমতাও তাদের নেই
তারা মানুষের সাম্যের মাঝখানে কাঁটা তারের বেড়া তুলে দিচ্ছে
এ কোন ভারতবর্ষে আমরা...

অন্ধ, গলা-ভাঙা, অভিমানী

অন্ধ, গলা-ভাঙা, অভিমানী
ফিরে এসো!

বসন্তে উড়েছে ছাই
ঝরে গেল নীল শূন্যতার মতো দিন

নক্ষত্রের ধ্বংসস্তূপে দীর্ঘশ্বাস অদৃশ্য নিশান
বাতাসে উন্মাদ সিঁড়ি যেন ঝাউবনে গত এক শতাব্দীর ঝড়

ফিরে এসো
হে অচিন্তনীয়, রাজ্যভাঙা স্বপ্নময়

টুকরো টুকরো অবিশ্বাসী, পলাতক
ফিরে এসো
বারুদ গন্ধের ঢেউ দু' হাতে সরিয়ে ফিরে এসো
দিনমান অন্ধকার, চতুর্দিক সশব্দ নীরব
ফিরে এসো
অন্ধ, গলা-ভাঙা, অভিমানী, হে প্রেমিক

ফিরে এসো।

ঋণ থাকে

কবিতা লেখার জন্য নদী আছে,
নৌকো কিংবা বেহুলার ভেলা, তাও আছে
যে মুহূর্তে লেখা হলো 'চুর্ণী' এই শব্দখানি
তখনই স্রোতের কাছে ঋণ জমা হলো
যার জানবার তাকে জানতে হয়, জানে, ঠিকই জানে।

পাগলা বাতাস এসে উড়িয়েছে ছবি, কিছু রং ফলিয়েছে
মন্দার বা তিল ফুলে সব ফিরে আসে
নিম্ননাভি অলসগমনা কেউ চলে গেল অমন চকিতে
দেওয়ালেও ফিরবে না, যদি ইচ্ছে হয়?
সবলে নারীকে কেউ আজও পায়নি জানা ইতিহাসে।

বকুল গাছের লাস্য, আলিঙ্গনও মুছে ফেলা যায়
প্রেমের তমসা নিয়ে লেখা যায় দুশো তিনশো পাতা
তারপরও বাকি থাকে, আকস্মিক বিস্মৃত মুহূর্ত
যেতে হয়, নদীর কিনারে যেতে হয়
হয়তো বা নৌকো নেই, বেহুলা তো আদপেই নেই
কলার মান্দাসে
আমাকেই একা একা ভেসে যেতে হবে।

স্থির চিত্র

এক একটা সুন্দর রাস্তায় একজনও মানুষ থাকে না
সোনালি রোদের আঁচে রাস্তাটি একাকিত্ব উপভোগ করে।
নানা রকমের সবুজ ছড়িয়ে থাকে দু'পাশে, একটি দুটি হলুদ খসে পড়ে।
দু'তিনটে গোরুর গাড়ি মনোকষ্টের মতন শব্দ করতে করতে অন্যদিকে
চলে যায় এদিকে তাকায় না
ঠিকাদাররা চেনে না এমন পথও রয়ে গেছে এই ব্যস্ত মহীমণ্ডলে?
কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই, মেটে মোরাম বিছানো, সরল বিস্তৃত
কখনো ঘুমোয়, কখনো জাগে
কৈশোর দুপুরের স্মৃতির মতন, আগামী শতাব্দীর স্বপ্নের মতন
কোনো নিষেধ নেই, তবু থমকে দাঁড়িয়ে আমি দেখি
সেই নিঃসঙ্গ পথটির অপরূপ নির্জনতা
পাছে সে অদৃশ্য হয়ে যায়, তাই চোখ বুঁজি।

পালাতে পারবে না

স্টেশানে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন, কাচ তোলা, কুচো কুচো বাচ্চাদের
বিরক্তিকর হাত দেখে মুখ ফেরাও, তুমি দেখতে পাবে
তোমার বাসমতী অন্নের মধ্যে কিলবিল করছে চুল
কলার খোসার মতন ওদের প্ল্যাটফর্মে ফেলে রেখে কোথাও পালিয়ে যেতে
পারবে না
দু'পাশে প্রকৃতি নেই, ঐ সব ছোট ছোট হাত উপড়ে নিচ্ছে অরণ্য
ওরাই শুষে নিচ্ছে নদী
রক্তবীজের ঝাড়, প্রতিদিন দ্বিগুণ থেকে চতুর্গুণ
দু'চারটে বাঘের পেটে গেলে বাঘও ভেদ বমি করে
কী ঝকঝকে ধারালো দাঁত ওদের, কী সাঙ্ঘাতিক কোমল প্রতিশোধ
খল খল করে হেসে ধেয়ে আসছে অযুত-নিযুত ধুলোমাখা শিশু
পালাতে পারবে না, যদি মানুষ হও, ফিরে দাঁড়াও
প্রভূত অন্যায়ের মধ্য থেকে খুঁজে নাও তোমার আত্মজকে!

শিল্প-সমালোচক

আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের দু'বছরের বাচ্চা মেয়েটি
দমকা হাওয়ার মতন যখন তখন তাকে দেখতে পাই
তার পায়ে এখনও রয়েছে টলমল ছন্দ
তার ভাষা আমি সব বুঝি না
বিশ্বব্যাপী দুর্বোধ্যতার ভেতরের সরলতাকে সে
খুলছে একটু একটু করে
এক একটি জিনিস তুলে ধরে সে নিজস্ব নাম দেয়
যা তার পছন্দ হয় না, তা সে অনায়াসে ফেলে দিতে পারে
সে রোদ্দুরকে বলে পাখি
আর আয়নাকে বলে জল
তারপর এক সময় হঠাৎ সে মা মা বলে ডেকে ওঠে
আমি মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করি, কোথায় তোমার মা?
সে দেয়ালে মোনালিসার ছবির দিকে আঙুল তুলে
বলে, ঐ যে!

নদী জানে

নিরালা নদীর প্রান্তে পড়ে আছে
দুঃখী মানুষের নীল জামা
আর কেউ নেই, রোদ নেই
ছায়ামাখা শূন্য দিন
লোকটি কোথায় গেছে?
সে কি জলে নেমে গেল
সহসা হৃদয় জোড়া পাতাল সন্ধানে?
অথবা সে শুয়ে আছে
জঙ্গলের কারুকার্যময় স্তব্ধতায়?
তার নগ্ন শরীরের ওপরে ঝরেছে
শুকনো পাতা
দুঃখী মানুষেরা কোনো চিহ্ন রেখে
যায় না কোথাও
তবু এই নদীতীরে পুঞ্জীভূত নীল সুতো

যেন কারো জীবনকাহিনী
যেন কিছু নিশ্বাসের সারমর্ম
রাজ্যহারা অভিমান, সুখচ্ছিন্ন চিঠি
ও যেন আমারই, আমি একদিন এইখানে
নিঃশব্দে ডুবেছি, নদী জানে।

এক এক দিন

এক এক দিন সুনিশ্চিত চোখ খুলে ঘুম ভাঙে
সে এক অন্যরকম জাগরণ, যেন পাহাড়ী নদীর কিনারায়
একা বসে থাকা
তখন আকাশ আমার দিকে তাকায়
বারান্দার ফুলগাছটার প্রতিটি পাতা আমাকেই দেখে
পৃথিবী নিস্তব্ধ এবং আর কোথাও কোনো মানুষ নেই
এরকম একটা পাতলা অনুভূতি পাখির পালকের মতন
বাতাস কেটে ঘুরতে ঘুরতে নামে
আমার দু'চোখ রক্তিম, শিরা উপশিরায় গত রাত্রির নেশা
ভারী চমৎকার পা ফেলে এগিয়ে যাই অলীকের দিকে
আমি চেনা জায়গায় নেই, আমি কোথায় আমি জানি না
নিশ্বাসে পাই ছেলেবেলার শিউলি ফুলের ঘ্রাণ যেন
কিশোরীর সদ্য-ফোটা, শব্দময় বুক
এইসব দিন এক জীবনে একটি-দুটি বারই আসে
তখন এই বিশ্ব অনায়াসেই অন্য কারুকে
দান করা যায়।

দেয়ালে নোনা দাগ

দেয়ালে নোনা দাগ মেঘের খেলা
শিয়রে বইগুলি পাখির মতো
অলস বিছানায় ছুটির বেলা
বাসনা অশ্বটি অসংযত।

মাথায় ব্যান্ডেজ, দুপুরে তবু
শরীর জেগে ওঠে আকাশময়
দিনের ঈশ্বর রাতের প্রভু
এখন তারা কেউ আমার নয়।

এই যে মেঘরাশি ছোট্ট ঘরে
এখানে অশ্বের তুমুল হ্রেষা
মাতৃবন্ধন ছিন্ন করে
আত্মধ্বংসের নিভৃত নেশা।

সাধের স্বর্গকে এখন পারি
সহসা বলে দিতে, নরকে যাও!
আকুল মূর্ধজা ছবির নারী
দু'হাত তুলে বলে, আমাকে নাও!

ছবির মানুষ

বাক্স ভর্তি একটা পারিবারিক গল্প নিয়ে স্টেশনের
ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে একলা বসে আছে
একজন মানুষ
তিন চার দিনের বাসী দাড়ি, ময়লা হাফ-হাতা টুইলের শার্ট
বিড়ির ধোঁয়ায় মুচড়ে উঠছে তার জীবন
আমার ইচ্ছে করে ওর কাছে গিয়ে বসতে, কিন্তু বসি না...

বাজারের পাশের গয়না-বন্ধকীর দোকানটির কেন্দ্রমণি হয়ে আছে
এক হৃষ্টপুষ্ট প্রৌঢ় মাকড়সা

একটি পোড়াটে চেহারার রমণী সেখান দিয়ে যেতে যেতে
একটু আস্তে হাঁটে, থামে না
তিনবার তাকায়
তার মধ্যে একটি চাহনি দশ-বারো বছর লম্বা
গুপ্ত দীর্ঘশ্বাসে সে উড়িয়ে দিয়ে যায় এক বিয়োগান্ত কাহিনী
কেউ টের পায় না...

সদর আদালতের পেছনের জামরুল গাছটার মাথায় থমকে থাকে
বিকেল চারটের উজ্জ্বলতম রোদ
একটা দোয়েল আধখানা গান হঠাৎ ফেলে রেখে কোথায়
মিলিয়ে গেল
ঐ দোয়েলের কোনো গল্প নেই, রোদ্দুরের কোনো গল্প নেই
কিন্তু জামরুল গাছটার নীচে ছাতা সারাইওয়ালার সামনে
উঁচু হয়ে বসে আছে যে লোকটা
এক মনে দেখছে সেলাই-এর সুচ-সুতোর ফোঁড়
তাঁর চোখের নীচে কালো সমুদ্র তটভূমি
সে কি সর্বস্ব ভাসিয়ে দিয়ে এলো এইমাত্র?

দিব্যি আছি

বুকের মধ্যে একটু আধটু দুঃখ পোষা
কিন্তু খুবই ভালো আছি
এই তো বেশ ঘুরছি ফিরছি
লম্ফ-ঝম্পে দিন পেরুচ্ছি
একটু খোঁচা, একটু ব্যথার টনটনানি
তবু বলবো দিব্যি আছি!

উল্টোপাল্টা ঝড়ের ধাক্কা খেয়েছি ঢের
সে সব হলো আগের জন্মে
যখন তখন আয়ুর খর্চা
আগুন হাতে ফুলের চর্চা
এই সবই তো খালিপেটের দুনিয়াদারি
দু'বার কি হয় মানবজন্মে?

নদীমাতৃক

নদীটির নাম সাসকাচুয়ান
দু'দিকে শুভ্র ঢেউ
এপারের আলো ওপারের হিম
ছাড়িয়ে হঠাৎ
পরা-বাস্তব কার যেন মুখ দেখে।
সহসা কিসের শব্দ উঠলো,
কে যেন বললো
বরফ ভাঙছে, শুনলে না কেউ?
বাতাস স্তব্ধ, আকাশের কোনো
চেনাশুনো নেই
শান্ত শায়িত ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যা...

আমি চলে যাই অন্য একটি
নদীর কিনারে
গ্রীষ্মদুপুর,
গয়না নৌকা
মাছধরা জাল
আড়িয়েল খাঁর তীরে বসে আছে
বাল্য মূর্তি
কপিশ মেঘের পটভূমিকায়
চিল সমারোহ
ভাটিয়ালি সুরে কে যেন ডাকছে
কার পুত্রকে
স্টিমারের ভেঁপু
দূরকে করেছে নিকট বন্ধু
মিহি দুঃখের কণা উড়ে যায় মেঘে।

কিসের বিষাদ, কেমন বিষাদ
মনেও পড়ে না
শুধু মনে পড়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকা
একাকিত্বের দারুণ গহন
চক্ষু না মেলে, শ্রবণ না খুলে
জীবনযাপন
এমন সময় নদী ডাকে নাম ধরে!

যাই যাই করে ওঠার আগেই
এ পৃথিবী কাঁপে
হাহা রবে কারা ধেয়েছিল যেন
ধুলোর কুহেলি
এদিকে ফাটল, ওদিকে ফাটল
মাটি খোঁজে জল, জলের শিকল
জলের আগুন,
জল-সংসার
প্লাবনের ধ্বনি
গর্ভ অতলে মিলিয়ে যাবার
প্রাকমুহূর্তে
কেউ যেন হাত ধরে দিয়েছিল টান!

নিপারের কূলে ভেঙে দিল ঘুম
দ্বিপ্রহরের
ক্ষণ আবল্লী
অতি বিখ্যাত সুন্দর চারদিকে
তবুও হঠাৎ আকাশ দু'ভাগ
চড়াৎ শব্দ
রুপালি ঝলক, ক্ষণ বিদ্যুৎ...
সেবারে বর্ষা অজয়ের পাড়
দাপিয়ে অনেক
দূরে ছুটছিল
সেতু উপড়িয়ে
খ্যাতি চেয়েছিল
মুথা ঘাস আর শালজঙ্গল
চাষীর মেয়ের বিবাহবাসর
সব ভেসেছিল ঘোলাটে প্রবল স্রোতে
আমিও গিয়েছি, ডুবেছি, ভেসেছি
এ নদীতে নয়
অন্য জোয়ার
এ দুনিয়া নয়, অন্য দুনিয়া
সে রকম ঘুম স্বপ্নে প্রথম দেখা!

এত সহজেই

ছোটখাটো ঘুম ছড়িয়ে রয়েছে এখানে ওখানে
নদীর কিনারে, বনে
ভোরের আলোর লূতাতন্তুর টুকরো টুকরো চাদর
যে-ছন্নছাড়া সময় উড়েছে, বারুদ পুড়েছে
সমগ্র যৌবনে
একবার তার নিতে সাধ হয় নির্জনতার আদর।
মনে পড়ে যায় কথা দেওয়া আছে বানভাসি গ্রাম
ভাঙা দেউলের কাছে
ফের দেখা হবে, পৃথিবী ঘুরছে, আমিও ফিরবো আবার
চাঁদ উড়ে যায় চৈত্রের ঝড়ে, চোখ ঝল্‌সায়
অহংকারের আঁচে
মুঠোয় বাতাস, এত সহজেই পেয়েছি যা ছিল পাবার!

যে আগুন দেখা যায় না

যে আগুন দেখা যায় না সে পোড়ায় বেশি
অণু-পরমাণু ঘিরে ধিকিধিকি জ্বলে
এ যেন তুলোর রাশি বাতাসের উৎসাহ জেনেছে
বৃষ্টি বা নদীও জানে
তারা সসম্মানে সরে যায়
যে আগুন দেখা যায় না সে পোড়ায় বেশি

জ্বলে তো জ্বলুক, পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে সব ছাই করে দিক।

আমার নয়

পাহাড় ভেঙে ভেঙে তৈরি হচ্ছে রাস্তা, আমার বুক ফেটে যায়
অথচ ঐ পাহাড় আমার নয়
পাহাড়ের ম্যাজেন্টা রঙের হৃৎপিণ্ড উপড়ে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়
কেউ একজন
আর কেউ পাহাড়ের উরুতে রাখে ডিনামাইট
বারুদের ধুলো মাখা মানুষ পিঁপড়ের মতন ছুটছে চতুর্দিকে
মনে হয় আমি মানুষও নই
মহারথী কর্ণের মতন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে
মহাবাহু শাল গাছ
সে আমার বন্ধু ছিল না, সে আমার মৃত বন্ধুর মতন
একটু একটু করে এগিয়ে আসছে পথ
সে অনেক দূর যাবে, সে দিগন্তকে ছোঁবে ঠিক করেছে
দিগন্তও এখন ধুলো কাদা মেখে খেলছে
সরলরেখারা প্রতিজ্ঞা করেছে, যা কিছু অসমান সব
সমান করে দেবে
এই পাহাড়ের আড়ালে আর সূর্য লুকোবে না, এখানে
আর নিচু হয়ে আসবে না আকাশ
সূর্য কিংবা আকাশও তো আমার নয়!

ফেরা না ফেরা

ফিরে এসো, ফিরে এসো, আমার মাথার দিব্যি,
ফিরে এসো
দেখোনি পথের কাঁটা, দেখোনি তমসা?
স্বপ্নের ভেতরে জানো শূল, অপাপবিদ্ধের শুভ্র
অভিশাপ হাসি
প্রতিটি ধ্বংসের পর কারা দেয় এত সকৌতুক করতালি?
আর কেউ নেই, আমি ছাড়া আর কেউ নেই, যে দেবে নিশান
তাহলে কোথায় যাবো, কার কাছে যাওয়া এই না-ফেরার পথে?
ফিরে এসো, ফিরে এসো, আমার মাথার দিব্যি,
ফিরে এসো।

দেখোনি স্থাণুর কীট? দেখোনি সমস্ত দিন
ভুলের কাঁকর আর মুখ ভরা অনিন্দার ধুলো?
এ রকম কথা ছিল? যখন তখন সব
প্রয়াগে বিলিয়ে দেওয়া শপথ ছিলো না?
ছিঁড়ে যাই হাজার অদৃশ্য সুতো, আরও কিছু
যার নাম মায়া
যাবো না? এখন না যদি যাই, তবে আর কবে?
ফিরে এসো, ফিরে এসো, আমার মাথার দিব্যি,
ফিরে এসো!

একমাত্র উপমাহীন

সারা জীবন খোঁড়াখুঁড়ির শেষ হলো না।
এ যেন সেই বালির নীচে নদী
অথবা নয় নদী, কেননা নারীর মতন নদীরাও
কখনো হয় খুব আপন?
অন্ধকার স্রোতস্বিনী নারীরা নয় অচেনা?
একমাত্র উপমাহীন তুমি আমার বুকের মধ্যে
আমার তুমি, কিংবা আমি তোমার?

রহস্যময় অজানা থেকে একটি দুটি শব্দ হঠাৎ উড়ে আসে।
তারা নিজেই কবিতা হয়ে গড়ে ওঠে,
আবার হয়তো ওঠে না!
আমিই লিখি, আবার তাকে আমিই অপছন্দ করি
নিজের ওপর রেগে উঠি, কে রাগায়?
মধ্যরাতের অস্থিরতা সে কি আমার?
যুক্তিবিহীন ভালোবাসা পাগল করে ছুটিয়ে মারে
অথচ আমি সবই জানি, তুমি জানো না?

এ পৃথিবী জানে

এ পৃথিবী জানে কারো কারো বুক শূন্য
এ পৃথিবী জানে কেউ ভ্রমরের খুনি
কেউ অবেলায় বিজনে হারায়, বিষণ্ণ বালিয়াড়ি
এ পৃথিবী জানে, মানুষে মানুষে
আজও চেনাশুনো হয়নি।

মানুষের জন্য নয়

এত ফুল, এর কোনটাই মানুষের জন্য নয়
মানুষের চোখের জন্য নয়, মানুষের ইন্দ্রিয়ের জন্য নয়,
সবই তুচ্ছ কিছু পোকা-মাকড়ের জন্য।
মানুষ তার রূপ দেখেছে, মানুষ তার ঘ্রাণ নিয়েছে
মানুষ লিখেছে কত কাব্য, লিখেছে গান।
জন্মদিন ও মৃত্যুদিনের মানুষ কুসুমসঙ্গী হতে ভালোবাসে
গোলাপ, গন্ধরাজ, চাঁপা, মল্লিকারা তা গ্রাহ্যও করে না,
তারা শুধু কীট পতঙ্গের জন্য মেলে রাখে সর্বস্ব।
হায় মানুষের জন্য একটাও ফুল ফোটে না।

সে

রেল লাইনে মাথা পেতে যে লোকটা শুয়ে আছে
সে বিশ্বশান্তির কথা চিন্তা করেনি
সে এসেছে অনেক দূর থেকে
অন্ধকার মাঠের মধ্যে বার বার হোঁচট খেতে খেতে
সে একজন কষ্টসহিষ্ণু মানুষ
সে কোন কবিকেও প্রেরণা দিতে চায় না।

দুই কবি: একটি কাল্পনিক সাক্ষাৎকার

গঙ্গাতীরে এক তীর্থক্ষেত্রে চৈত্র সংক্রান্তির পুণ্যস্নান
এসেছে অসংখ্য মানুষ, বলদর্পী রাজপুরুষ, বহু অকিঞ্চন
অনেক সৌভাগ্যবতী রমণী, তেমনই অনেক অভাগিনী
এসেছে বৃদ্ধ ও শিশুর দঙ্গল, প্রহরী ও পরস্ব-অপহারী
এবং দুই কবি।

একজন বহু খ্যাতিমান, সম্ভ্রান্ত ও মাল্যবান, সার্থকতা মাখা মুখ
এসেছেন পাল্কী-বেহারা ও সাঙ্গোপাঙ্গ, ঐশ্বর্যের বিচ্ছুরণ নিয়ে
মিথিলার রাজকবি ইনি, বিদ্যাপতি।
অন্য কবিটিকে কেউ চেনে না এখানে, অতি সাধারণ
পরিব্রাজী ব্রাহ্মণের মতো, অঙ্গে সেলাই-বিহীন বসন
মুণ্ডিত মস্তকে দীর্ঘ শিখা, ধূলি-ধূসরিত নগ্ন পা
ইনি বাশুলী-সেবক চণ্ডীদাস।

প্রথম অবগাহনের পর বক্ষ-সমান জলে দাঁড়িয়ে
সূর্যবন্দনা করছেন বিদ্যাপতি।
চণ্ডীদাস জলে নামেন নি এখনো, অল্প দূরে, তীরে দাঁড়িয়ে
মুগ্ধ ভাবে দেখছেন, শুনছেন গভীর অভিনিবেশে
জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর, অতি নিখুঁত দেবভাষায় শ্লোক উচ্চারণ।

স্নান সেরে ওপরে এলেন বিদ্যাপতি, শিবিরের দিকে পা বাড়িয়ে
শীর্ণকায় ব্রাহ্মণের উৎসুক নয়ন দেখে থামলেন,
আজ তিনি কোনো প্রার্থীকেই ফেরাবেন না
হাঁক দিয়ে বললেন, ওরে, কে আছিস
এই ভিক্ষুটিকে দে কিছু তণ্ডুল ও স্বর্ণকণা!
চণ্ডীদাস ছুটে এসে নতজানু হয়ে বসলেন
বিদ্যাপতির পায়ের কাছে, আবেগবিহ্বল কণ্ঠে বললেন,
আপনি যে আমার প্রতি কৃপার দৃষ্টিতে চেয়েছেন
তাতেই ধন্য হয়েছি আমি, হে কবিকুল-তিলক
আমি শুধু দর্শন করতে এসেছি আপনাকে। এ অধমের নাম
দীন চণ্ডীদাস।

বিরক্তিসূচক ভুরু কপালে উঁচিয়ে বিদ্যাপতি
বললেন, সদ্য স্নান করে এসেছি আমি, তুমি অস্নাত,

ব্রাহ্মণ, আমায় তুমি স্পর্শ করলে?
যেন বিদ্যাপতি তাঁকে পদাঘাত করবেন, এই ভেবে
দ্রুত সরে এলেন চণ্ডীদাস, হাত জোড় করে বললেন,
গঙ্গাতীরের বায়ুও পবিত্র, হে মান্যবর, এই বাতাসে
যে আচমন করেছে তার স্পর্শে কিছু অশুচি হয় কি?
এখানের ধারাবর্ষণও তো গঙ্গোদক, আমি সিক্ত ভোরের বৃষ্টিতে।

বিদ্যাপতি : তবু জেনে রেখো, শুচি বা অশুচি যাই হোক
পুরুষের স্পর্শে আমার প্রদাহ হয়, পুরুষেরা পরস্পর
দূরে থাকা ভালো।

চণ্ডীদাস : আমি অপরাধী; দর্শনই যথেষ্ট ছিল, পাদস্পর্শে
আমার অতি ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে, ক্ষমা করুন।

দুই ভৃত্য দুই দিক থেকে মুছে দিতে লাগলো বিদ্যাপতির
গৌর তনু, তিনি ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে রইলেন আকাশের দিকে
অকস্মাৎ দৃষ্টি নামিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি, কী নাম বললে হে,
চণ্ডীদাস? যেন চেনা চেনা
তুমি কিছু গীত রচেছো নাকি?
চণ্ডীদাস আপ্লুত স্বরে উত্তর দিলেন,
স্বয়ং রচনা করি এমন সাধ্য কি আমার!
দেবী বাশুলীর দয়া, কখনো আমাকে দিয়ে
কিছু কাব্যলহরীর প্রকাশ ঘটান!

বিদ্যাপতি : 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ', তুমি...মহাশয়,
আপনি কি সেই চণ্ডীদাস?

চণ্ডীদাস আছেন অসংখ্য কবি, তার মধ্যে অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক
চণ্ডীদাস। আমি সে-ই বটে!

ভৃত্য দু'জনকে সরে যাবার ইঙ্গিত করলেন বিদ্যাপতি
তার প্রশস্ত ললাট হলো সীমাবদ্ধ
উন্নত মুখশ্রীতে পড়লো বিষাদের ছায়া
দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এবারে বুঝেছি!
আমার স্মৃতি-বিভ্রম, ঊষাকাল থেকেই আমি রয়েছি বিষম অন্যমনা
সেই সুযোগে আপনি
বিদ্রূপের কশাঘাত হানতে এসেছেন আমাকে।
আপনি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি
আর আমি এক রাজভৃত্য মাত্র!

চণ্ডীদাস : এ কী কথা বলছেন, হে কবি-অগ্রগণ্য

আপনার খ্যাতি এ ভারতমণ্ডলে কে না জানে?
স্বয়ং মহারাজ শিব সিংহ আপনার কাব্যসুধার অনুরক্ত
এমনকি দিল্লির বাদশাহ পর্যন্ত দিয়েছেন জায়গির...

বিদ্যাপতি — অবশ্যই! রাজসভায় যত আছে বেতনভুক পাঠক
তারা উচ্চৈস্বরে গায় আমার অলংকারবহুল কাহিনী-গাথা
অভিজাতবৃন্দ তা শোনে, বুঝুক বা না-বুঝুক আহা আহা করে
আর, আপনার গীত আস্বাদন করে
আপামর জনসাধারণ দূর দূরান্তরে
আমি জানি, বাতাস-বৃষ্টি ও রৌদ্রের মতন স্বতঃস্ফূর্ত
আপনার পদাবলী সমগ্র রাঢ়-বঙ্গে
অতি সাবলীল ভ্রমণ-স্বপনে যায়
আপনি ধন্য, আমি বন্দী!

চণ্ডীদাস — কাব্যকলার অধীশ্বর, আপনি, আমাদের গুরু
আপনার রসজ্ঞান ও শাস্ত্রজ্ঞান গঙ্গা-যমুনার
মতো মিলে মিশে আছে
আপনার শব্দ ঝংকার, চকিত রঙিন উপমার ব্যবহার
আপনার নব রসের অতি নিপুণ সুষ্ঠু প্রয়োগ
এসব কোথায় পাবো আমি
আমি শিক্ষাহীন, দীন হীন অভাজন।

বিদ্যাপতি — অনেক জেনেছি, তাই আমি সারল্য ভুলেছি।
সুষ্ঠু নব-রস নয়, প্রথম রসেরই স্রোত বইয়ে দিয়েছি বেশি
কেননা নপুংসক রাজবর্গ শুধু ও রসেই তৃপ্তি পায়।

চণ্ডীদাস : আপনি অমর প্রেম-সঙ্গীতের উদ্গাতা

বিদ্যাপতি : আর আপনি, বিপ্র চণ্ডীদাস, প্রণয়ের সঙ্গে
অবাধে মেশাতে পেরেছেন উদাসীনতা
আপনি গান বেঁধেছেন কানু ও রাইকে নিয়ে
আমার কাব্যে ওরা রাধা-কৃষ্ণ, যেন অন্য মানুষ
আমার কৃষ্ণের সঙ্গে লালসাময় বয়স্ক রাজার আদল
আর আপনার কানু যে-কোনো রাখাল।

চণ্ডীদাস — আপনি পেয়েছেন প্রতিষ্ঠা

বিদ্যাপতি — আপনি পেয়েছেন নাম-না-জানা অসংখ্য মানুষের ভালোবাসা

চণ্ডীদাস — কী যে বলেন, মহাকবি! আমি অভাজন
দুবেলা জোটে না অন্ন, হট্টমন্দিরে শুয়ে থাকি
যদি পেতাম আপনার মতন স্বাচ্ছন্দ্য, সুখের আশ্রয়
হয়তো আর একটু মন দিতে পারতুম কাব্য-সরস্বতীর
সাধনায়!

বিদ্যাপতি আমার অন্ন ও বস্ত্র প্রয়োজনের অনেক বেশি, তাই
এসেছে অরুচি!
পার্থিব কিছুরই নেই অভাব, হায়, তবু
অপার্থিব কোনো চিন্তা মস্তিষ্কে আসে না!

চণ্ডীদাস আপনি পেয়েছেন রাজমহিষী লছিমা দেবীর প্রশ্রয়
এমন সৌভাগ্য হয় কোন কবির?

বিদ্যাপতি আমিও শুনেছি, রজকিনী রামতারা, নারী শ্রেষ্ঠা,
আপনার সাধনসঙ্গিনী

চণ্ডীদাস : সে যে অতি নগণ্যা

বিদ্যাপতি : তবু সে-ই জানে প্রণয়ের গূঢ় মর্ম, তাই আপনার কবিতার
প্রতিটি চরণে এত সুধা-সরোবর!
রাজমহিষীর আলিঙ্গন
আমাকে দিয়েছে শুধু সোনার শৃঙ্খল!

চণ্ডীদাস কবি বিদ্যাপতি, আপনি মিছে আত্মগ্লানি করছেন
যে জীবন অনিশ্চিত, পদে পদে অন্নচিন্তা, প্রতিবেশীদের
অবহেলা
সে জীবন সুখের মোটেই নয়, বড় জ্বালা, পথে পথে
অনেক কণ্টক
অনেক সয়েছি আমি, আজ ক্লান্ত, পেতে ইচ্ছে হয়
কিছু স্বস্তি, কিছু আরামের দ্রব্য, কিছু উপভোগ।

বিদ্যাপতি : আমার তো ইচ্ছে হয় সর্বস্ব দিতে বিসর্জন!
এখনো সময় আছে...

চণ্ডীদাস কী আশ্চর্য, আপনি স্বেচ্ছায় বরণ করতে চান দারিদ্র্য?
অথচ দরিদ্র আমি, মনে ছিল সুপ্ত অভিলাষ
আপনার সূত্র ধরে পাই যদি কোনো রাজ-অনুগ্রহকণা
একখানি নিজস্ব কুটির, কিছু শস্যভূমি

বিদ্যাপতি থমকে রইলেন ক্ষণকাল, বুঝি অশ্রুবাষ্পে
রুদ্ধ হয়ে এসেছে তাঁর কণ্ঠ
পুনরায় মুখ তুলে বললেন, ভ্রাতঃ, তা হলে আসুন
এখুনি বদল করি আমাদের দু'জনের জীবনের গতি
নিন সব মূল্যবান বস্ত্র, অলঙ্কার, দাসদাসী
ভিক্ষা দিন আপনার ছিন্ন উত্তরীয়
আসন গ্রহণ করুন আপনি রাজসভায়
আমি ভ্রাম্যমাণ হবো উন্মুক্ত প্রান্তরে
রানী লছিমার বক্ষ আপনার আশ্রয় হোক,